যাদের স্বার্থে কালো টাকা সাদা

লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া**

আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দিক থেকে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমান বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পরই তাঁর অবস্থান। খোদ প্রধানমন্ত্রী বহু বিষয়ে তাঁর ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভর করেন, আস্থা রাখেন। আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ করে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে সাইফুরের গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। মন্ত্রিপরিষদের প্রভাবশালী মন্ত্রীরাও জানেন, অর্থমন্ত্রী কোনো সিদ্ধান্ত নিলে সেটাই মোটামুটি চূড়ান্ত। বিষয়টি অর্থমন্ত্রীও জানেন, বোঝেন এবং তদনুযায়ী ক্ষমতার চর্চা করেন। এহেন ক্ষমতাধর মন্ত্রীকে যদি নিজের কোনো জোরালো সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাঁর ক্ষমতা কিছুটা খর্ব হয়েছে। আর এই সরে আসার জন্য তিনি যদি দুঃখ প্রকাশ করেন, তাহলে বুঝতে হবে তিনি খানিকটা অসহায়ও।

আগামী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত ৬৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকার জাতীয় বাজেটে ৭.৫% হারে কর দিয়ে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ ২০০৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বাড়ানোর ঘোষণার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রীর এই 'ক্ষমতা খর্ব ও অসহায়ত্বের' প্রতিফলন ঘটেছে। একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠেছে, কে বা কারা সেই ক্ষমতাধর যাদের চাপের মুখে সাইফুর রহমানের মতো প্রভাবশালী মন্ত্রীর এ অবস্থা? উত্তরটি খুব সহজ না হলেও আভাস-ইঙ্গিতে কিছু বিষয় তো জনগণের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবং সবকিছু ছাপিয়ে এই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়ার বিষয়টিই এখন বাজেটের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর হবেই না বা কেন? বাজেটের আগে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইর সঙ্গে এক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার ভাষায় বলে দিয়েছিলেন, 'হারাম জিনিস বারবার হালাল করার সুযোগ দেয়া যায় না।' তিনি আরো বলেছিলেন, কোনোভাবেই তিনি আর এ সুযোগ অব্যাহত রাখবেন না। তাঁর জোরালো ঘোষণায় সবাই আশাবাদী হয়েছিল যে, এবার হয়তো তিনি কালো টাকার মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেবেন। কিন্তু বাজেট ঘোষণায় হয়ে গেল উল্টো। অর্থমন্ত্রী অবশ্য বাজেট-পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে স্বীকার করেছেন যে, তিনি নিয়মিত ও প্রকৃত করদাতাদের প্রতি অন্যায় করেছেন। তবে সাংসদরা চাইলে তিনি বাজেট পাসের আগে এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন।

কতো টাকা কালো

একটা বিষয় এখন খুব পরিষ্কার, দেশে কালো টাকার পরিমাণ দিনকে দিন বেড়েই চলেছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে কালো টাকার মালিকদের দৌরাত্ম্য ও প্রভাব। এখন দেশে কি পরিমাণ কালো টাকা আছে তার কোনো সঠিক বা প্রায়-সঠিক হিসাব নেই। বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. আবুল বারকাত কিছু তথ্য-পরিসংখ্যান ও সূচক ব্যবহার করে একটি অনুমিত হিসাব দিয়েছেন। তাতে বলা হয়েছে, দেশে বছরে ৭০ হাজার কোটি টাকার বেশি কালো টাকা সৃষ্টি হচ্ছে। তার মানে, কালো টাকার পরিমাণ আমাদের মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) প্রায় ৩০%। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশে প্রাক্কলিত জিডিপি ২ লাখ ৬৫ হাজার কোটি টাকার ওপরে। তার মানে, এই বিপুল পরিমাণ কালো টাকা স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে, নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্নভাবে। আর যারা কালো টাকার মালিক তারাও ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে। কালো টাকা নিয়ে অর্থমন্ত্রীর দ্বিমুখী আচরণ সে বিষয়টিকেই প্রতিষ্ঠা করল যা একটি সুস্থ সমাজের জন্য অত্যন্ত আতঙ্কজনক ও অশুভ।

সাধারণত চোরাচালানসহ বিভিন্ন বেআইনি কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আয় কালো টাকার উৎসরণ ঘটায়। এসব আয়করের আওতায় আসে না, সরকারিভাবে এর কোনো হিসাবও পাওয়া যায় না। কালো টাকার দৌরাত্ম্য বাংলাদেশে এখন এতোটাই বেশি যে, কার্যক্রম এখন অনেকটাই প্রকাশ্য দিবালোকে

এই কালো টাকার মালিক ও এদের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা যে খুব বেশি না তা বোঝা যায়। এদের কারো কারো লক্ষ্য হলো নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংক দেয়া। ব্যাংক না পারলে বীমা কোম্পানি দেয়া। বর্তমান সরকার এখন পর্যন্ত নতুন কোনো ব্যাংকের অনুমতি দেয়নি। তাই বলে যে দেবে না তার নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না

সংঘটিত হচ্ছে। সরকার সহজে দেশে কালো টাকার তৎপরতা স্বীকার করতে না চাইলেও একাধিকভাবে বিষয়টি বড় আকারে প্রকাশ পেয়েছে। প্রায় দুই বছর আগে চট্টগ্রামে অস্ত্রের যে একটি বিশাল চালান ধরা পড়েছে, এর পেছনে যে কালো টাকার বিনিয়োগ ছিল তা স্পষ্ট। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বিভিন্ন অনুসন্ধানে সমাজের উচ্চ পর্যায়ের লোকদের কর ফাঁকি দেয়ার বিভিন্ন ঘটনা থেকে বোঝা যায় কালো টাকা কতোটা সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে। আর তাই সরকারের উচিত ছিল দেশে কালো টাকার পরিমাণ কতো তার একটি হিসাব তৈরি করা। একই সঙ্গে কোন কোন উৎস থেকে কালো টাকা তৈরি হচ্ছে তা নির্ণয় করে সেখানে নজরদারি বাড়ানো ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। বর্তমানে যে মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন চালু করা হয়েছে তা কালো টাকা নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট সহায়ক নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের জন্য হয়রানিমূলক।

কালো টাকার বাস্তবতা স্বীকার করে এর আগেও বিভিন্ন বাজেটে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বাজেটের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে অপ্রদর্শিত আয় নিয়মিত করার সুযোগ। সর্বশেষ ২০০৩-০৪ অর্থবছরে যে সুযোগ দেয়া হয়েছিল তা চলতি বছরের ৩০ জুন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। এনবিআরের হিসাব থেকে জানা গেছে, এই সুযোগের আওতায় মাত্র ২ হাজার কোটি টাকারও কম সাদা হয়েছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে হতাশাজনক। অর্থমন্ত্রী সম্ভবত এই হতাশা থেকেই কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছিলেন। তিনি অবশ্য যুক্তি দাঁড় করিয়েছেন এই বলে যে, অর্থনীতিতে কালো টাকার একটি অশুভ তৎপরতা চলছে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে শেষ সুযোগ হিসেবে এটি দেয়া হয়েছে। কালো টাকার অশুভ তৎপরতার কথা সত্যি। তবে অর্থমন্ত্রীর এহেন যুক্তি নাকচ করে দিয়েছে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান বাজেট-পরবর্তী এক সংবাদ সম্মেলনে পাল্টা প্রশ্ন করেছেন, 'কালো টাকা সাদা না করার বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর জোরালো বক্তব্যের পর মাত্র ৪-৫ দিন আগে অর্থনীতিতে কি এমন হলো যে তিনি তড়িঘড়ি করে শেষ মুহূর্তে এ প্রস্তাব রাখলেন?' তিনি আরো বলেন, কালো টাকার অশুভ তৎপরতা অর্থমন্ত্রী সারা বছর ধরে না বুঝে মাত্র বাজেটের কয়েক দিন আগে বুঝতে পারলেন- এমন বক্তব্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

নেপথ্যে কারা

প্রাক-বাজেট আলোচনায় সরকারদলীয় সাংসদরা অর্থমন্ত্রীকে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) বরাদ্দ বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে তাদের এ দাবি অনেকটাই পূরণ করেছেন

বর্তমান জোট সরকার ক্ষতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী ও সাংসদসহ সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলের অল্প কিছু মানুষের হাতে বিভিন্নভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ জমেছে। এসব অর্থ এসেছে বড় ধরনের চাঁদাবাজি, বিভিন্ন সরকারি ক্রয় ও টেন্ডারের কমিশন, বিভিন্ন কাজে সুবিধা পাইয়ে দিতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উপঢৌকন, কাজ পাওয়ার পর খুশি হয়ে দেয়া উপহারসহ বিভিন্ন উৎস থেকে

অর্থমন্ত্রী। এডিপির আয়তন বিদায়ী (২০০৪-০৫) অর্থবছরে মূল ও সংশোধিত বাজেটের চেয়ে যথাক্রমে ১১.৪% ও ১৯.৫% বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। এখানে স্থানীয় সরকার খাতে সর্বোচ্চ ব্যয় বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য কিন্তু স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করা নয়। শক্তিশালী করার জন্য দিলে বরাদ্দের পরিমাণ বিদায়ী বছরের চেয়ে মাত্র ১.৬% বাড়ত না। বরং এখানে কিছু বাড়তি অর্থ দেয়া হয়েছে, যেন সরকারদলীয় সাংসদরা নিজেদের এলাকায় লোকদেখানো কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড (যেমন রাস্তাঘাট নির্মাণ) করতে পারে। অন্যদিকে এডিপিতে থোক বরাদ্দ বাবদ ৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা রাখা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি। এই থোক বরাদ্দ রাখার মানেই হলো কোনো রকম হিসাব-নিকাশ ছাড়া ইচ্ছেমতো অর্থ অপচয় করা।

তবে সরকারদলীয় প্রভাবশালী সাংসদসহ সরকারের ঘনিষ্ঠ বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিরা প্রকাশ্যে যে দাবিটি করেননি, সম্ভবত সেটি হলো এই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দেয়া। বিশেষ করে বর্তমান জোট সরকার ক্ষতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন মন্ত্রী ও সাংসদসহ সরকারের ঘনিষ্ঠ মহলের অল্প কিছু মানুষের হাতে বিভিন্নভাবে প্রচুর পরিমাণ অর্থ জমেছে। এসব অর্থ এসেছে বড় ধরনের চাঁদাবাজি, বিভিন্ন সরকারি ক্রয় ও টেন্ডারের কমিশন, বিভিন্ন কাজে সুবিধা পাইয়ে দিতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উপঢৌকন, কাজ পাওয়ার পর খুশি হয়ে দেয়া উপহারসহ বিভিন্ন উৎস থেকে। সরকার ক্ষমতার মেয়াদের দুই-তৃতীয়াংশ সময় অতিক্রম করার পর এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এসব অর্থের নিরাপদ বিনিয়োগ করা। অর্থমন্ত্রী এসব লোক সম্পর্কে জানলেও এদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিষয়ে হয়তো অতোটা জানতেন না। ফলে এদের সম্মিলিত চাপে অনেকটা অসহায়ের মতো তাঁকে পিছু হটতে হয়েছে।

এই কালো টাকার মালিক ও এদের মাধ্যমে সুবিধাভোগীর সংখ্যা যে খুব বেশি না তা বোঝা যায়। এদের কারো কারো লক্ষ্য হলো নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংক দেয়া। ব্যাংক না পারলে বীমা কোম্পানি দেয়া। বর্তমান সরকার এখন পর্যন্ত নতুন কোনো ব্যাংকের অনুমতি দেয়নি। তাই বলে যে দেবে না তার নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না। কারণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে একাধিক প্রস্তাব জমা পড়ে আছে অনেক দিন থেকে। কোনো কোনোটির জন্য তদবিরও বাড়ছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি) বাজেটের আগেই জাতীয় অর্থনীতির বিশ্লেষণমূলক এক আলোচনায় নতুন ব্যাংক-বীমা খোলার তৎপরতা শুরু হওয়ার আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করেছিল। আর বাজেটের ওপর প্রাথমিক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে গিয়ে সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য তীব্র ভাষায় কালো টাকা সাদা করার সুযোগের সমালোচনা করেন। তিনি এক পর্যায়ে এও বলেন, 'এই কালো টাকা যেন নতুন ব্যাংক-বীমা স্থাপনে বিনিয়োগ না হয়। এই কালো টাকা ব্যবহার করে যেন রূপালী ব্যাংক কেনা না হয়।' সিপিডি আরো আশঙ্কা করছে, কালো টাকা সাদা করার সুযোগ নিয়ে এগুলো বিনিয়োগ করা হবে বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠান ক্রয়ে।

নির্বাচন প্রভাবিত করাই উদ্দেশ্য!

কালো টাকার মালিকরা আগামী সংসদ নির্বাচনে বড় ধরনের অর্থায়ন করবে বিভিন্ন মন্ত্রী-এমপিদের। ফলে জোট সরকারের লোকজনের কাছে এরা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এদের সুযোগ-সুবিধা না দিলে অর্থের যথাযথ প্রাপ্তিযোগ নাও হতে পারে। সুতরাং বাজেটের মাধ্যমে এমন সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে, যেন আইনগত কোনো বাধা তৈরি না হয়। শুধু কালো টাকার মালিক নয়, বড় বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতি বিভিন্নভাবে কর ফাঁকি দেন বা কম দেন। তাদের জন্যও সুবিধা সৃষ্টির সুযোগ করা হয়েছে যেন তারা আরো ব্যবসা করে আরো বেশি টাকা চাঁদা দেন। বাজেটের এসব পদক্ষেপ ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য আরো বাড়াবে, গরিব মানুষের বঞ্চনা প্রকট করবে। দারিদ্র্য হ্রাস কৌশলপত্রের (পিআরএসপি) আলোকে বাজেট তৈরির নামে গরিব ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন প্রহসন করা কী ক্ষমতাসীনদের উচিত হচ্ছে?